ভাষা, শিষ্টভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, লোকভাষা

সুস্নাত জানা

সংক্ষিপ্তসার

ভাষা কি, কাকে বলে ? ভাষা কিভাবে সৃষ্টি হল ? একটি ভাষা প্রথমে কিভাবে গড়ে উঠল। তারপর ভাষাগোষ্ঠীর এলাকা বৃদ্ধির ফলে একটি অঞ্চলের ভাষা কিভাবে তার আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হয়ে উঠল– যাকে আমরা 'ভাষা' বলি। এখন তার পরিচয় দিয়েছি। আবার সেই আঞ্চলিক ভাষার বৃহৎ গোষ্ঠীর ভাষা হয়ে ওঠার পর, তা কেমন করে শিক্ষিত জনের মার্জিত উচ্চারণের ফলে শিষ্ট ভাষার জন্ম দিল। এই ভাষা, শিষ্টভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা কিভাবে গোষ্ঠী জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ লোকভাষার জন্ম দিল তার পরিচয় দিয়েছি। আবার এই ভাষাই সামাজিক ভাষা হিসেবে কিভাবে সমাজ ভাষা বিজ্ঞানে পরিচয় হয়ে উঠছে তারও বর্ণনা দিয়েছি।

সূচক

তাই ভাষা ও লোকভাষার প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হিসেবে এই গদ্য একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়ে উঠেছে।

আদিম মানুষের ডাকে সংকেত বিনিময়ের প্রাগভাষা থেকেই একদিন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল, এরকম একটি অনুমান করা যেতে পারে। যদিও সে ভাষা ছিল সীমাবদ্ধ। আর সেই বদ্ধ পূর্বভাষা থেকেই একদিন মুক্ত, অনন্ত সম্ভাবনাময় উৎপাদনী শক্তির ভাষা সৃষ্টিই মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভাষা হল মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মননের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট (Sturtevant Edgar H) ভাষার সংজ্ঞায় লিখেছেন— 'A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interract.[১]

ভাষা হল মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমবায় যার সহায়তায় সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। সমাজ অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে ওঠা এক-একটি গোষ্ঠী নিজস্ব ধ্বনি প্রতীকের ব্যবহারে গড়ে তুলল ভাব বিনিময়ের নতুন নতুন ভাষা, ক্রমে মানব সমাজ আরও বিস্তৃত ও বিচিত্রক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। এক একটি গোষ্ঠীর সীমানাও প্রসারিত হতে থাকল। ফলে ধ্বনিরূপ, উচ্চারণরীতি, পদগঠন, শব্দ প্রতীকের বিচিত্র বিন্যাসের জন্য সারা পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ভাষা গড়ে উঠল, তেমনই একই ভাষার মধ্যে নানা রকম ছোটখাটো বিভেদ-প্রভেদের মধ্যে দিয়ে একই ভাষা সমুদ্রে গড়ে উঠল অসংখ্য ছোট ছোট ভাষাদ্বীপ। আজ তাই সেই একই ভাষার অসংখ্য স্তর, নানান প্রকার ভেদ।

ভাষা হল কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ, যার দ্বারা একটি বিশেষ সমাজের লোকজন নিজেদের মধ্যে ভাব-ভাবনা বিনিময় করে। যখন কোন জনসমষ্টি এরকম একই ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে তখন তাকে ভাষাতত্ত্ববিদরা একটি ভাষা সম্প্রদায় বলে। যেমন বাঙালী, ফরাসী, জার্মানী প্রভৃতি। আবার এই একই ভাষা সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যে থাকে, তখন তারা তাদের নিজস্ব জগতে বাস করে, প্রাচীন ঐতিহ্য, জাতি-বর্ণলিঙ্গগত ঐক্য বা অনৈক্য, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার নিজস্ব জগতে সে বিচরণ করে। অর্থাৎ এই ভাষা সম্প্রাদয়ের গোষ্ঠী বা বর্গ বিভেদ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ আন্তঃক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার সংগঠন অথবা অর্জিত জ্ঞান তাদের ব্যবহৃত ভাষার সমগ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু ক্রমে যখন গোষ্ঠীটি বড় হতে থাকে তারপর তাদের ভাষাভাষী মানুষের সীমানা প্রসারিত হতে থাকে, ভাষিক স্তরের পরিধি বেড়ে যায়, তখন একই ভাষার ভৌগলিক প্রসারতার জন্য, জলবায়ু, আচার আচরণ ও পরিবেশ ক্রমে বদলে গিয়ে ভাষারও পরিবর্তন আসে। কিন্তু সেই পরিবর্তন প্রথমে এতো বৃহৎ নয় যে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলের ধ্বনিরূপ, বাক্যগঠন পদ্ধতি বা শব্দোচ্চারণের ধারা পসস্পরের থেকে স্বতন্ত্র। একটি বিশেষ ভাষাভাষীর উচ্চারণ পদ্ধতি, ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতি সমন্বিত বাচকতার সুশৃঙ্খল বিন্যাসের যেমন দুটি ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক হয়, তেমন পার্থক্য থাকে না। তবু অন্য এক ধরনের পার্থক্য থাকে। যার ফলে ঐ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের ভাষার কিছু পার্থক্য থেকে যায়। ফলে তখন একই ভাষার মধ্যে একাধিক রূপ গড়ে উঠে।

একটি সমাজে নানা কাজের সুবিধার জন্য মানুষ একটি ভাষার একাধিক রূপের থেকে একটি রূপকে বেছে নেয়। সেই রূপটি শিষ্ট ভাষা হয়ে উঠে। কিন্তু এই যে সমাজের একটি ভাষা শিষ্ট হয়ে উঠল, তার অর্থ এই নয় যে ঐ ভাষার অন্য রূপগুলি অশিষ্ট। প্রত্যেক ভাষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বাচনরীতি আছে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত এবং ব্যাকরণগত

পার্থক্য আছে, তবু সেই আঞ্চলিক ভাষাগুলির কোনো একটি অন্যটির চেয়ে উন্নত নয় বা অনুন্নত নয়। আবার ভালোও নয় খারাপও নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে বা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণে একটি অঞ্চলের ভাষা শিষ্ট হয়ে গেছে। এবং এই শিষ্ট সম্পূর্ণ আরোপিত। যেমন কলকাতার ভাষাকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষেরা শিষ্ট ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছে তার কারণ এমন নয়, যে ঐ অঞ্চলের ভাষা অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার চেয়ে উন্নত। অষ্টাদশ শতক থেকে কলকাতা শহর বন্দর হিসেবে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে এবং নতুন শাসকদের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এরকম নানা কারণে কলকাতা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠায় তার ভাষাই শিষ্ট ভাষা হয়ে উঠল। আজ যদি মুর্শিদাবাদ আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠত, তাহলে মুর্শিদাবাদের ভাষাই শিষ্ট ভাষা হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় নি, তাই কলকাতার বাইরে আর সব অঞ্চলের বাংলা ভাষা হয়ে উঠল উপভাষা বা dialect, অ-শিষ্ট বা non-standard. প্রত্যেক ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষই দু'ধরনের ভাষায় অভ্যস্ত হয়। একটি তার নিজের অঞ্চলের ভাষা। যে ভাষা সে জন্ম থেকে শিখে এসেছে; এ হল তার মাতৃ ভাষা। আর একটি ভাষা শিষ্ট ভাষা। যেটি সে ব্যবহার করে শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানিক কাজকর্মে ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তায়। আর নিজের লোক, নিজের বাড়ির লোক, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যবহার করে নিজের মাতৃভাষা।

এক ই ভাষাগোষ্ঠীর শিষ্ট ভাষার বাইরের আঞ্চলিক ভাষার রূপগুলিকে বলা হয় উপভাষা। তার মানে এই নয় যে শিষ্ট ভাষাই হল প্রকৃত ভাষা, তা উপভাষা নয়। আসলে আমরা যাকে উপভাষা বলি, সেই উপভাষার ভাষিক স্তরের পরিধি বাড়তে বাড়তে একাধিক উপভাষা পরিধি গড়ে ওঠে। আর সেই বিভিন্ন উপভাষারই বিমূর্ত রূপ হল ভাষা। বা ভাষা হল একটি বিশেষ ভৌগোলিক স্থানে বাসবাস করে এবং এই ভৌগোলিক স্থানের অধিকাংশ লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। আবার এরকমও বলা যায়, একই ভৌগোলিক স্থানে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের ভাষাগুলির মধ্যে পরস্পরের বোধগম্যতা আছে যথেষ্ট। তাই ঐ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলিকে বলব একই ভাষার রূপভেদ। কলকাতার বাংলা, মেদিনীপুরের বাংলা, বাঁকুড়ার বাংলা, কোচবিহারের বাংলা, ঢাকার বাংলা, রাজশাহীর বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলা একদিক থেকে প্রত্যের বাংলা অপরের থেকে ভিন্ন, আবার তাদের প্রত্যেকের ভাষার এই আঞ্চলিক ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা আছে বলেই তারা সবাই বাংলা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তার মানে প্রত্যেকটিই বাংলা ভাষা।

আর সে জন্যই কোন বিশেষ উপভাষাকে আমরা মূল ভাষা বলতে পারব না। সবই বাংলা। তাই বাংলা ভাষা বলতে আমরা বুঝি এই সমগ্র বাংলারই এক বিমূর্ত রূপকে। বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় আজ কুড়ি কোটি মানুষের ব্যবহৃত ভাষার একটা সাধারণ রূপকে।

আমরা যখন বাংলা ভাষার আলোচনা করি, তখন এর একটি উপভাষারই আলোচনা করি। সেই আলোচনা সাধারণত শিষ্ট ভাষার, কিংবা অ-শিষ্ট ভাষারও হতে পারে। অথবা সমস্ত উপভাষার মধ্যে একটি সামান্য ক্ষেত্র খুঁজে নিই। এই সামান্য ক্ষেত্রই ভাষাও উপভাষার দ্বৈতরূপের সন্ধান দেয়।

ভাষার সংজ্ঞায় A Dictionary of Linguistics-এ বলেছে, 'A specific from of A given language, spoken is a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language'[২]

এই সংজ্ঞায় যে Standard ভাষার কথা বলা হয়েছে তা শিষ্ট ভাষা নয়, মান্য ভাষা, আবার ভাষা এবং উপভাষার পার্থক্য কিন্তু সুস্পষ্ট হয়। কারণ ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। আবার তা শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে পরস্পরের আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। আবার এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে যদি রূপকে চরমরূপে চলে যায়, যে পরস্পরের মধ্যে বোধগম্যতা হারিয়ে যাচ্ছে, তখন তা থেকে আবার একাধিক ভাষার জন্ম হয়।

উপভাষার পার্থক্য হল অঞ্চলে অঞ্চলে ভাষার পার্থক্য। এই পার্থক্য হল ধ্বনিগত, রূপগত, অন্বয়গত, শব্দগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত। এই অঞ্চল আবার রাজনৈতিক সীমা দ্বারা ভাগ করা নয়।এ ধরনের শাসনগত সীমানাপেরিয়ে ভাষার অঞ্চল আরো অনেক দূরে প্রসারিত হতে পারে। যেমন পশ্চিম বাংলার সীমান্ত মানেই আমরা বাংলাভাষার আঞ্চলিকতা পেরিয়ে এসেছি এমন নয়। বরং আরো দূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। আবার একই অঞ্চলের মধ্যে একাধিক আঞ্চলিক ভাষা মিশে থাকতে পারে। যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সীমান্ত ঘেঁষে যে ঝাড়খন্ডের অঞ্চল সেখানে বাংলা, হিন্দী ও ঝাড়খন্ডী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ও ওড়িশার সীমান্ত ঘেঁষে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী অঞ্চলের বাংলায় একই সঙ্গে তিন ধরনের উপভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফলে বিভিন্ন উপভাষার ক্ষেত্রও একে বারে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

এই যে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে উপভাষার পার্থক্য রয়েছে তা কেবল ভৌগোলিক কারণে নয়। তাছাড়া আরও অনেক রকমের ভেদ রয়েছে। যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিত্তিতে, আবার একই ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ভেদে। যেমন তামিল ভাষার শব্দের গোড়ায় য, জ, ড, দ ব প্রভৃতি অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিগুলি কেবল ব্রাহ্মণদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এমন কি সাধারণ বর্ণ ও তপশিলী জাতি-উপজাতিগোষ্ঠীর ভাষার পার্থক্য। ভাষার ভেতর শুধু ধর্ম ও গোষ্ঠী ভিত্তিক নয়, শিক্ষা, অর্থ, রুচি এবং লিঙ্গ ভেদ এই পার্থক্যের কারণ

হয়ে দাঁড়ায়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভাষার পার্থক্য বা বিভিন্ন বৃত্তিতে ভাষার পার্থক্য বৈশিষ্ট্য ও ভাষার সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে সামাজিক ভাষা শাস্ত্র। আমি এই প্রবন্ধে এরকমই ভাষাকে লোকভাষা বলছি। একটু পরে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

উইলিয়ম লাবভ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ Social stratification of English in New york city আর্থিক ও শিক্ষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রচুর ভাষা সংগ্রহ করে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও ভাষাগত পার্থক্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। এক কালে ভাষার মধ্যে ভিন্নতাকে tree variation বলা হত। যেমন কেউ quard শব্দটিতে /r/ এর উচ্চারণ করল, কেউ করল না। আবার কেউ brard-এর উচ্চারণ করল bad এরকম। এক সময় এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। কারণ এর দুটোই ঠিক। যেমন বাংলায় আমরা কেউ উচ্চারণ করি 'দরোজা' কেউ 'দরজা'। লাবভ আলোচনা করে দেখালেন এই Free variation কিন্তু সব সময় free নয়, বরং তা বক্তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এগুলি ব্যক্তিভাষার বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়। এরা গোষ্ঠী ভাষা, সামাজিক ভাষা। তখনও লোকভাষা শব্দটি গড়ে ওঠেনি বলেই লাবভ যেমন একে 'সামাজিক উপভাষা' বলেছেন, শিশির কুমার দাশও লিখেছেন, 'সামাজিক উপভাষা ভৌগোলিক উপভাষা থেকে ভিন্ন, কারণ তার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, রুচি ইত্যাদির ওপর।' শুধু ভৌগোলিক কারণেই ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায না। সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত পার্থক্যও ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করে। আবার উপভাষাগুলি 'ব্যক্তি' ভাষার সমষ্টিগত রূপ। ব্যক্তি ভাষা হল প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য আছে। খুব সামান্য হলেও আছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যও আছে, আবার ঐক্যও আছে, আর ভাষা ব্যবহারের তারে বোধগম্যতা এত বেশি যে পার্থক্যও ধরা পড়ে কদাচিৎ।

এই ভাষার ব্যক্তিগত বাচন এবং সামাজিক রূপ নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করলেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর। জন্ম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। অল্প বয়সেই তিনি অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ব করেন। লাইপৎজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তিনি সেই সময় সারা ইউরোপ জুড়ে নব্য ব্যাকরণবাদে বিপুল ভাষার কথা জানতেন। একুশ বাইশ বছর বয়সে তিনি প্রবন্ধ লেখেন, তার বিষয় ছিল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার আদিম স্বরধ্বনি। জার্মানী থেকে ফ্রান্সে ফিরে সোস্যুর সংস্কৃত, গথিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাচর্চা শুরু করেন। 'একোল প্রাতিক দে উতেজেকুদেস'-এ। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯১১-র মধ্যে তিনটি অত্যন্ত দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাঁর ছাত্রদের কাছে। ১৯১৩-তে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোস্যুরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছাত্র শার্ল রাবি এবং আলবেয়ার সেশেহায় তাঁর

আলোচনাই সোস্যুরের নামে সাধারণ ভাষাতত্ত্ব (Cours the linguistiqce Génératé) একটি বই প্রকাশ করেন। ১৯১৬ তে এটি প্রকাশিত হলে তা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে। মানুষের ভাষা চিন্তার ইতিহাসে এটি স্মরণীয়তম রচনাগুলির অন্যতম। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভাষা সম্পর্কে গঠনবাদী (structuralist) মতবাদ গড়ে উঠে। এখানে সোস্যুর ভাষার অর্থের (meaning) দিকটি বাদ দিয়ে শুধু তার ধারাবাহিক গঠনের (Gestalteinheit structure) দিকে জোর দেন। তাঁর মতবাদ তাই গঠনবাদের (Structuralism) পূর্বসূচনা। সোস্যুর ভাষার এই বহিরঙ্গ গঠনের এককালীন (Synchronic) বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [৩]

এই গ্রন্থে তিনি দুটো ধারণার সূত্রপাত করলেন 'লা পারল' (La Parol) ও 'লা লঙ্' (La langue)। তিনি ভাষাতত্ত্বের তিনটি স্তর বিভাগ করেন Langage (Language), Langue (Speech) এবং parole (act of speaking). Langage যদি হয় ভাষার বিষয়ে এক স্বয়ং প্রভ ধারণা (intuition), যা মানুষ তার সহজাত সৃজনশীল ক্ষমতা হিসেবে সার্বভৌম নির্বিশেষ সৃজনী সমর্থের প্রকাশ। এ হল একটি ভাবনামূর্তি, এমন একটি স্মৃতিবাহী পদ্ধতি, যা কতকগুলি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ক্রমসঞ্চয়ে মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে অর্জিত হয়। লঙ্ হল ভাষার সামাজিক রূপ ভাষার সমস্ত নিয়মের পুঞ্জীভূত রূপ, তা ব্যক্তিগত রূপ থেকে পৃথক। তা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত। সোস্যুর বলেছেন,

Speech is many-sided and heterogeneous; straddling several areas simultaneously-physical, physiological, and psychological-it belongs both to the individual and to society: We cannot put it in to any category of human facts, for we cannot discover its unity. Language, on the contrary, is a self-contained whole and a principal of classification. As soon as we give language first place among the facts of speech, itself to no other classification [8]

La Parole লা পারোল হল ভাষার ব্যক্তিগত এবং ব্যবহারিক রূপ। ব্যক্তির মস্তিষ্ক কোষে ক্রমিক সঞ্চয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সে তো অর্জিত হয় ব্যক্তির নিজের সামর্থ ও বাচন পদ্ধতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্যক্তির এই বাস্তব বাচনপ্রক্রিয়াকেই সোস্যুর বলেছেন parole। উত্তরকালে বিংশ শতকের শেষার্ধে নোয়াম চমস্কি তাঁর রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক [Transformatinal Generative] ব্যাকরণে বলেছেন Langue মানুষের বাচন প্রক্রিয়ার Competence বাংলা ভাষা প্রয়োগের দিকটি তুলে ধরে, আর Parole তুলে ধরে তার performance বাংলা ভাষার প্রয়োগের দিকটি। লা পারোল ব্যক্তিগত, সেই জন্যই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন, ব্যক্তির খেয়াল খুশি, চিন্তাভাবনা সৃজনশক্তির দ্বারা প্রভাবিত, তাই তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপযোগী। যেহেতু পারোল লঙ্

এর প্রকাশের performance -এর দিকটি তুলে ধরে তাই এর প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক সংস্কার। বক্তা ও শ্রোতার আঞ্চলিক দূরত্বের পার্থক্য থাকতে পারে Dialect বা উপভাষায়। আবার আঞ্চলিক বিভেদ না থাকলেও সামাজিক ব্যবধান থাকতে পারে Sociolect বা সমাজ ভাষায়। এমনকি পরিবেশ ও প্রসঙ্গ বা ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক সময় আঞ্চলিক বা সামাজিক স্থিতাবস্থার বিচ্যুতি ঘটাতে পারে। একই ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে তাগিদ অনুসারে তখন প্রয়োজন হয় Code-switching এর। Code হল, 'an arbitrary, pre-orranged set of signal' কথাটি বলেছেন Gleason.[৫] আবার Hudson বলেন, Dode switching হল 'in which a signal speeaker uses different verieties at different itmes.'[৬] অর্থাৎ performance কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয়, ভাষার ব্যবহারগত প্রকার বা Resister. ভাব প্রাসঙ্গিক অথবা প্রসঙ্গহীন প্রয়োগ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে সে নানারকম সংকেতের ব্যবহার করে। এমন কি নৃতাত্ত্বিক অর্থে বাকি ভাষার সাংগঠনিক এ সমস্তই ভাষার বহুমুখী ব্যবহারিক প্রয়োগের সমাজনিষ্ঠ দিক।

ভাষা অর্থাৎ কথা বলার এই সমাজগত দিকটিকে মনে রেখেই আধুনিক সমাজ ভাষা বিজ্ঞানীরা যে কোনো ভাষার তিনটি স্তর স্বীকার করে থাকেন। ম্যাক্‌ডেভিড, গ্লিসন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা এই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন। শিষ্টভাষা [Cultivated speech], জনভাষা [Common speech], এবং লোকভাষা [Folk speech]। এখানে শিষ্টভাষা হল শিক্ষিত শহুরে এবং উচ্চবিত্ত/মধ্যবিত্তের পরিশীলিত ভাষা। লোকভাষা হল বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা- যা নানা কারণে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে ক্রমে। আর জনভাষা হল এমন ধরণের ভাষা, যা উভয়ের আপেক্ষিক ধর্মে দোলাচলবৃত্তি আশ্রয় করে।

আমি আগে এই অধ্যায়ে উপভাষা শিষ্টভাষার আলোচনা করে দেখিয়াছি। এ ধরনের বিভাজন আপেক্ষিক। কারণ প্রতিটি ভাষাস্তরই কোন-না কোন ভাবে প্রসারণশীল অথবা সংকোচনধর্মী। আবার এই তিনটি স্তর ছাড়াও আরও একাধিক স্তর বিভাগ সম্ভব। যেমন শিষ্টভাষা ধীরে ধীরে মান্যভাষা হয়ে উঠে। আমরা যাকে Standard language বলি, তেমন জনভাষাও, সেই ভাবেই নিম্নগতিতে জনভাষাও ব্রাত্যভাষায় (patois) পরিণত হতে পারে।

সাধারণভাষার মধ্যে যে অগণিত বৈচিত্র্যের স্তর আছে, যেমন ভাষার আঞ্চলিক বা সামাজিক ভেদ, তার ওপর উপভাষাগত প্রভাব বা প্রয়োজন সে বিদেশী বা বহিরাগত উপাদানকে আত্মস্থ করছে, অথবা তার প্রথাবিমুক্ত বৈচিত্র-এ সবকে ঝেড়ে বেছে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডে একটি প্রথাবদ্ধ প্রণালীতে বা রীতিতে তাকে Formalised করার প্রয়াস সব সময়ই ঘটছে। এ ঘটে চলেছে অবিরত, নিঃশব্দে, বক্তার অজ্ঞাতেই। এমন কি আজকের এই মোবাইল, ইন্টারনেট, দূরদর্শন-এর যুগে যখন অতি প্রান্তিক গ্রামজীবনের মধ্যেও অনায়াসে

এসব মাধ্যম প্রবেশ করেছে। ফলে জনভাষা যেরকম শিষ্টভাষার অভিমুখী , ঠিক তেমনই লোকভাষাও। লোকভাষাও শিষ্টভাষা এই অর্থে উভয়ই পরস্পর প্রতীপ। তবু বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্ত নিজস্ব সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভাবনায় গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকভাষায় এক ধরনের সীমাবদ্ধতা; সেটা পরিবেশের জনভাষা বা শিষ্টভাষার পারস্পরিক চাপে অথবা গোষ্ঠীভাবনা পোস্টমডার্নাইজেসন-এর ফলে ভাষাবন্ধনের সীমাবদ্ধতা এক ধরনের সংকোচনশীলতার অভিমুখী বা পরিণতি লাভ করতে চলেছে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে গোষ্ঠীভাবনার আবশ্যিক পরিণতিতেই লোকসাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য এসেছে। ধর্মীভাবনার প্রকাশ লিঙ্গ ধারণা শাসিত মেয়েকি ছড়া, ব্রতকথা, ভাদু-টুসুর গান, বা আদিবাসী ধারণার ছড়া ধাঁধাঁ, প্রবাদ, মৈমন সিংহ গীতিকার আঞ্চলিক ধর্মীতা, পটের গান, মুর্শিদার গান, খনা বা ডাকের বচনের মতো ইতিহ্যানুগত প্রভৃতি বৈচিত্র্য সত্ত্বেও লোকসাহিত্যে ভাষাগত অবয়বে সংকোচন ধর্মীতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন codification বা সূত্রীভবনের ফলে লোকসাহিত্যের ভাষিক স্তর সংকুচিত হয়ে আসছে। যদিও এখন লোকভাষার শব্দভান্ডার ও বাক্যরীতি বিভাগেও এ ধরনের সূত্রায়ন লক্ষ করা যাচ্ছে।

এর বিপরীতক্রমে কোনোভাষাই কিন্তু একটি স্থবির অবয়ব নয়। এমনকি মান্যভাষারূপে সংহত ও সূত্রবদ্ধ হওয়ার পরও তার সম্প্রসারণশীল সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন ভাষার সামাজিক দায়িত্ব ও মূল্যমান বেড়ে চলে, তখন তাতে বিষদীকরণ বা Elaboration দেখা যায়। মান্যভাষায় এ আখছার ঘটে থাকে। সাধারণ ও আঞ্চলিক উপভাষাগুলির পারস্পরিক টানে, বিভিন্ন ভাষিক স্তরের উপাদান গ্রহণ করে বিদেশী ভাষার প্রভাবে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ অফুরান শব্দভান্ডার গড়ে তুলে। এই বিষয়ীকরণের ক্ষেত্রে Code বা প্রতীক গ্রহণের দুটি ভাগ রয়েছে, যেমন বিশদ প্রতীক বা Elaborated Code, আর সংকীর্ণ প্রতীক বা Restricted Code বিশদ প্রতীকের Potentialits বা অর্জনক্ষমতা বহুমুখী ও প্রসারণধর্মী। তার অর্থগত আবেদন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসাদমুক্ত হওয়ায় সর্বজনীন তার ব্যবহারও তাই নৈর্ব্যক্তিক। ফলে মুক্ত (Explicit) এবং বহিঃপ্রকাশিত। আর সংকীর্ণ প্রতীক হল বিশেষ (Particularistic) আর অধিক প্রসঙ্গবদ্ধ (Context-bound) তার ব্যবহার ব্যক্তি আশ্রয়ী ফলে তা শ্রোতার পূর্ব ধারণার দ্বার নিয়ন্ত্রিত। ফলে তা অন্তঃক্রিয়াশীল এবং বদ্ধ (Implicit)

এই হিসেবে শিষ্টভাষা লোকভাষা থেকে এক ধাপ অগ্রগামী, আর মান্যভাষা আবার তারও থেকে অগ্রবর্তী। এই আদর্শায়নের ভিত্তিতে শিষ্টভাষা আর লোকভাষার মধ্যে শিষ্টভাষা এগিয়ে। শিষ্টভাষা হল ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভেদগুলির যে কোনো একটি যদি নির্বাচিত আদর্শরূপে সর্বজনমান্য বা সর্বজনীন হয়ে উঠে। তবে তাকে বলব শিষ্টভাষা। শিষ্টভাষার এই আদর্শরূপ গড়ে উঠার পেছনে কোনো ঐতিহাসিক কারণ বা সম্ভ্রান্ত মানুষের পদমর্যাদা

প্রদাধিকার থাকতে পারে। আবার এই বিশেষ নির্বাচন ভৌগোলিক দূরত্ব, সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীগত বা কোনো সাংস্কৃতিক ব্যবধানের জন্য বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিরোধের মুখোমুখী হতে পারে। আর এই প্রতিরোধের কেন্দ্রই হয়ে উঠতে পারে কোনো গোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা সাংস্কৃতিক সংহতি। লোকভাষা এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেরই প্রকাশ মাধ্যম। শিষ্টভাষা এবং লোকভাষার পার্থক্য গড়ে উঠে এই নির্বাচনের আপেক্ষিক তারতম্যকে কেন্দ্র করেই।[৭]

যেহেতু জনভাষা শিষ্টভাষার নিচে অবস্থান করে, আবার তা বিভিন্ন লোকভাষা ও গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠে। সুতরাং সমাজের একদম গ্র্যাসরূটে ছোট ছোট বিভিন্ন গোষ্ঠী বাস করে। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এক একটি একক। এই এককগুলি যেহেতু একই সমাজে বাস করে, তাই তাদের পারস্পরিক ভাববিনিময়। আদানপ্রদানের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে যে যোগাযোগ মাধ্যম (Interect) গড়ে তুলে তাই হল জনভাষা। জনভাষা হল ম্যাগডেভিড, গ্লিসনদের কথিত Common speech. একেই আমরা বলি folk language বা গ্রাম্যভাষা। সমাজভাষাবিজ্ঞানী হেনরি হেনিগসোয়া লড্ এ ভাষার বিষয়েই অনুসন্ধান করেছিলেন। ৮ এই জনভাষাই যখন একটি অঞ্চলের সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করে তখন তা সেই অঞ্চলের উপভাষা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আমরা যদি লোকভাষা থেকে একটু এগিয়ে এসে একাধিক লোকভাষাভাষী গোষ্ঠীর পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের ভাষা হিসেবে জনভাষাকে দেখি। তবে সেই জনভাষা যখন একটি অঞ্চলের সমগ্র মানুষের সাধারণ ভাষা হয়ে উঠল, তখন তা উপভাষা, কিন্তু জনভাষা যেরকম Codification-এর ফলে উপভাষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। লোকভাষা তার বিপরীত, লোকভাষা একটি বিশেষ জনভাষা এবং উপভাষা অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও তার নিজস্ব ভাষার স্তরকে সে কখনই সর্বজনীন করে তুলে না। তা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর উপভাষা যা আঞ্চলিক ভাষার, তার মধ্যে একটি শিষ্টভাষা হয়ে মান্য ভাষার স্তরে এগিয়ে চলে। সুতরাং ভাষার চলরূপ অনেকটা এরকম। লোকভাষা→ জনভাষা→ শিষ্টভাষা→ মান্যভাষা।

একটি উপভাষাই ভাষা (স্বীকৃত ভাষা) হয়ে উঠতে পারে। আবার ভাষা থেকেও উপভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ ভাষা-উপভাষার সম্পর্ক অনেকটাই ডিম আগে না মুরগী আগে এই বিতর্কের মতো। কিন্তু উপভাষা থেকে লোকভাষার জন্ম হয় না। একই লোকভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থাৎ অঞ্চল ভেদে প্রায় একই। যেমন মেদিনীপুরের বা বাঁকুড়ার কুমোর, বা বীরভূমের কুমোর কি কোচ বিহারের, এদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার ভাষিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু লোকভাষার অথবা তার গোষ্ঠী বা বৃত্তিগত ভাষা ব্যবহারের প্রায় কোনো পার্থক্য নেই। উপভাষার একাধিক উপাদানের মধ্যে লোকগোষ্ঠীরা ও অন্তর্ভুক্ত। তবু উপভাষার (১) যে আঞ্চলিক গণ্ডীবদ্ধতা আছে, (২) তার যে নিজস্ব ভাষিকরূপ নিভাষা Idiolect আছে, (৩) উপভাষার আদর্শ, স্বয়ম্ভরতা, ঐতিহাসিকতা ও সজীব চলমানতা এ সব লোকভাষার

নেই। এই জায়গায় লোকভাষা অনেকখানি বদ্ধ। সে জন্যই উত্তরাধুনিকতার প্রভাবে তার মৃত্যুও ক্ষয় অনিবার্য। তাই তাকে সংরক্ষণ আজ আসু প্রয়োজনীয়।

তথসূত্র

১. Sturtevant, Edgar. H. : An Introduction to linguistic science, New Haven. Yale University press, 1947.

২. Pei Mario A. and Gaynor, Frank : A dictionary of Linguistics, peter Owen, 1970, P-56

৩. শিশিরকুমার দাশ : সমাজ ও ভাষাতত্ত্ব, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, পৃ-১১৫

৪. Ferdinand de Saussure: Course in General Linguistics, New York; Mc Graw-Hill, 1966, P.-9

৫. H.A. Gleason : An Introduction to Descriptive Linguistics, 1961, P.-374

৬. R.A. Hudson : Sociolinguistics, 1983, P. 56-58

৭. E. Hangen : Dialect, Language, National (1966) edt. by J.B. Pride and J. Holems (Penguin, 1972) P.-91-111 পরেশচন্দ্র মজুমদার : লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে, লোকভাষা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ-৩

৮ পবিত্র সরকার লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, Henry M. Hoeniwswald : A proposal for the study of Folk- Linguistics, William Bright ed. 1971 sociolinguistics, The Hague & Paris, Manton & co.p.16-27